দাম ২ টাকা

পৃথিবীর ডায়েরি

বছর ১৫, সংখ্যা: ১১ | প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ক পত্রিকা | ফেবরুয়ারি ২০১৫

আকাশ পথে উঠে, নেমে হিমালয় পার

পরিযায়ী হাঁস পাহাড়ের প্রাচীর পেরোয় তাদের নিজস্ব উড়ান পদ্ধতিতে যা শক্তি সাশ্রয় করে

প্রতি বছর শীতের সময় হিমালয় পেরিয়ে পাখিগুলি মঙ্গোলিয়া আর তিব্বত থেকে কয়েক'শ কিলোমিটার আকাশপথ পেরিয়ে উড়ে আসে ভারতে। কারণ, ওই সময় সেখানে যতটা ঠান্ডা পড়ে, এখানে ততটা নয়। তাই পরিযায়ী হাঁসেদের কাছে এ দেশের শীত বেশ মনোরম মনে হয়। বসন্তের বাতাসে যখন আবার গ্রীষ্মের আগমনের আভাস পাওয়া যায়, তখন তারা সেই হিমালয় পেরিয়ে পুনরায় ফিরে যায় তিব্বত আর মঙ্গোলিয়ায়।

কিন্তু ওই আসা যাওয়ার পথে তাদের পেরতে হয় হিমালয়ের প্রাচীর। যেখানে ২০ হাজার, ২৫ হাজার, ২৯ হাজার ফিট উচ্চতা পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে নানা তুষার শৃঙ্গের সারি। তাই উড়োজাহাজের মত উড়তে উড়তে তাদের উঠতে হয় অনেক উঁচুতে, তবেই পেরন যায় সেই বরফ-ঢাকা পর্বতমালা। কিন্তু উড়োজাহাজের থাকে জোরাল ইঞ্জিন, ট্যাঙ্ক ভরতি জ্বালানি, দিক আর উচ্চতা নির্ণয়ের নানা আধুনিক যন্ত্রপাতি, আর হাঁসেদের সম্বল কেবল তাদের দুটি ডানা। আর শক্তি জোগানোর জন্য শরীরে সঞ্চিত

তিব্বত আর মঙ্গোলিয়া থেকে হিমালয় পেরিয়ে উড়ে আসে এই হাঁস

মেদ। বলা হয় এডমন্ড হিলারি আর তেনজিং নোরগে যখন ১৯৫৩ সালে এভারেস্ট জয় করার উদ্দেশ্যে হিমালয়ের দুর্গম পথে এগিয়ে চলেছেন, তখন সেই আভিযানের এক সদস্য এভারেস্টের ওপর দিয়ে এক ঝাঁক হাঁস উড়ে যেতে দেখে ছিলেন। শৃঙ্গ জয়ের পর অভিযাত্রীরা ফিরে এলে জানা যায় সে কথা।

কী করে হাঁসেরা ওই দুরূহ উড়ান সম্পন্ন করে, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কৌতুহল ছিল অনেক কাল ধরে। মনে করা হত ওই পাখিরা আকাশে ২০/২৫ হাজার ফিট ওপরে উঠে, সোজা একটানা উড়ে, হিমালয় পেরিয়ে যায়। কিন্তু এখন, ইংলন্ডের ব্যাঙ্গর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞানী চার্লস বিশপ তাঁর গবেষণা থেকে জেনেছেন যে তারা ঠিক একটানা সোজা পথে ওড়ে না। তারা অনেক উঁচুতে উঠে যায়। একটা পাহাড় পেরিয়ে নেমে আসে খানিকটা, আবার ওঠে, পাহাড় পেরয়, আবার নামে, আবার ওঠে। আর ওই ভাবে পেরতে থাকে একের পর এক পর্বত প্রাচীর।

কেন ওই ওঠা নামা? কারণ, উচ্চতা যত বাড়ে বাতাস ততই হাল্কা হতে থাকে, আর হাল্কা হাওয়ায় ভেসে থাকা এবং উড়ে চলা দুইই বেশ কষ্টসাদ্ধ কাজ। কসরত করতে হয় অনেক বেশি। শরীরে সঞ্চিত শক্তি খরচ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি। তাই ওরা উঁচুতে উঠে, একটা পাহাড় পেরিয়ে আবার নীচের দিকে নামতে নামতে কম কষ্টে অনেকটা পথ এগিয়ে যায়। দেখা গেছে হাঁসেরা একটানা ১৭ ঘন্টা পর্যন্ত উড়ে চলে, আর ওই দীর্ঘ উড়ানকালে তাদের ডানা দুটি বিশ্রাম পায় না এক মুহূর্তের জন্যও। চিলের মত ওরা ডানা মেলে আকাশে ভেসে বেড়াতে পারে না।

জানা গেছে আরও কিছু কথা। যেমন, নীচের দিকে নামার অন্য একটা কারণ হল ওপরের তুলনায় সেখানে অক্সিজেন বেশি। তাই শরীরে অক্সিজেনের চাহিদা মেটাতেও তারা নামে নীচের দিকে। তাছাড়া উঁচুতে হাল্কা হাওয়ায় ওড়ার সময় তাদের ডানা ঝাপটাতে হয় বেশি। তখন তাদের হৃদযন্ত্রের ওপর চাপ বেড়ে যায় অনেকটা। নীচের দিকে নামলে নিঃশ্বাস আবার কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

এমনি করে উড়তে উড়তে হিমলয়ের সীমানা পেরিয়ে একদিন ক্লান্ত হাঁসের ঝাঁক দেখতে পায় সুদূর প্রসারিত সমতলের মাটি মিশে আছে আকাশের গায়ে। তখন মহানন্দে তারা তাদের চেনা মাটি, চেনা জলাশয়ের দিকে ঝাঁক বেঁধে নামতে থাকে। এক দীর্ঘ উড়ান শেষে থিতু হয় সেখানে। আর তখন সেখানে কান পাতলেই শোনা যায় পরিযায়ীদের কলরব।

সূত্রঃ লাইভ সায়েন্স

জানা অজানা

সুরের ভাষা বোঝে সকলে

সুরের কোনও ভাষা নেই। সুরের ভাষা বোঝে সকলে। এটি একটি প্রচলিত ধারণা। কঙ্গোর জঙ্গলে বসবাস করে যে মানুষ তাদের গান বাংলার মন জয় করতে পারে, আবার বাংলার গান সেখানকার পিগমিদের মন মাতাতে পারে। সঙ্গীত যে কোনও সীমানা মানে না এই বিশ্বাস এখন অনেকটাই বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমানিত। মার্কিন, জার্মান আর কানাডার বৈজ্ঞানিকরা এক সঙ্গে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

আফ্রিকার কঙ্গোয় গভীর জঙ্গলে থাকেন এমবেজেলি উপজাতির পিগমি মানুষ।

পিগমি শব্দটির মানে 'ছোট'। অর্থাৎ ওই এমবেজেলি সম্প্রদায়ের মানুষজন বেশ বেঁটে। তাঁরা যেখানে থাকেন সেখানে রেডিও, টিভি, টেলিফোন কিছুই নেই। ফলে বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। পর্ণ কুটিরে তাঁদের বাস। বনে শিকার করে, ফলমূল জোগাড় করেই তাঁরা খান। এবং নিজেদের গানবাজনাই তাঁদের মনোরঞ্জনের খোরাক জোগায়। তাঁদের সেই অরণ্যে ঘেরা গ্রামে একদিন গিয়ে হাজির হলেন গবেষকরা, সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ইংরেজি সঙ্গীত।

এক দিন সঙ্গীতের আসর বসল। ইংরেজি বাজনার সঙ্গে থাকল পিগমিদের নিজস্ব গানবাজনাও। তাঁরা নিজেদের গান যতটা উপোভোগ করলেন প্রায় ততটাই করলেন বিদেশের বাজনা। অন্যদিকে কানাডার মন্ট্রিয়ল শহরে যখন ইংরেজি সঙ্গীতের সঙ্গে কঙ্গোর

এবার ২ পাতায়

অচল হাত সচল থাকে মনের কল্পনায়

কথায় বলে মন ভাল থাকলে শরীরও ভাল থাকে। তাহলে কি আমাদের মন – আমাদের ভাল লাগা, খারাপ লাগা বা আমাদের চিন্তার শক্তি কি আমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির ওপর প্রভাব খাটাতে পারে? আমরা কি আমাদের চিন্তার বলে আমাদের হৃদযন্ত্র, ফুসফুস, যকৃত, পাকস্থলি বা দেহের অন্য যে কোনও অঙ্গকে ভাল থাকতে বা সেরে উঠতে উৎসাহিত করতে পারি?

মনের কথায় যে কাজ কখনও কখনও হয় তার একটা উদাহরণ হল 'প্ল্যাসিবো'। প্ল্যাসিবো আসলে কোনও ওষুধ নয়; ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, বা সিরারেপ মত দেখতে কোনও খাদ্য বা পানীয় যা মহৌষোধী বলে বিশেষ রোগীদের দেওয়া হয়। ওই রোগীদের প্রকৃত কোনও অসুখ থাকে না কিন্তু তাঁরা মনে করেন তাঁরা অসুস্থ। এক সময় এক নামকরা চিকিৎসক তাঁর এমনই এক রোগীর কথা বলেছিলেন। অনেকদিন ধরে সেই রোগী পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন।

নানা পরীক্ষার পরেও তাঁর রোগের কোনও কারণ ধরা পড়ছে না। কোনও ওষুধও কাজ করছে না রোগীর শরীরে। ডাক্তারবাবু নিজেও একটু বিব্রত বোধ করছেন রোগ নির্ণয় করতে না পারার জন্য। আর ঠিক তখনই সেই পরিস্থিতিতে রোগী নিজেই তাঁর রোগের রহস্যের সমাধান করে দেন। একদিন ডাক্তারবাবু তাঁকে পরীক্ষা করতে এলে, রোগীটি আক্ষেপ করে বলেন, ছোটখাট কম দামের ওষুধে তাঁর অসুখ সারার নয়! ফলে, কয়েক দিনের মধ্যেই চোখে লাগার মত বাক্সে আসে বেশ 'দামী' 'বিদেশি' ওষুধ, যা খাওয়ার নিয়ম কানুনও ততোধিক জটিল। কিন্তু ওই ওষুধ খেয়েই খুব দ্রুত সেরে ওঠেন ভদ্রলোক। আসলে সেগুলি দামীও নয়, বিদেশিও নয়, এমন কী ওষুধও নয়। সে গুলি ছিল এক প্রকারের প্ল্যাসিবো – বিশেষভাবে প্রস্তুতকরা মিছরি। ডাক্তারবাবু বলেন রোগীর রোগটা ছিল তাঁর মনে। ব্যথার উৎসটা পেটে নয়, ছিল মগজে। দামী, বিদেশি ওষুধ পড়েছে জেনেই পেটের ব্যথা সেরে যায়। ডাক্তারি শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্ল্যাসিবোর কার্যকারিতা স্বীকৃত।

মাথা যেমন কাল্পনিক ব্যাধি সৃষ্টি করে আর সারায়ও, তেমনই আবার মনগড়া সঙ্কেত পাঠিয়ে শরীরের কোনও কোনও অঙ্গের কোষগুলিকে সতেজ, সবল রাখতে সক্ষম হয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় তেমনটাই জানা গেছে। শরীরের কোনও অঙ্গ যদি অনেকদিন অচল থাকে তাহলে তার মাস্‌ল বা পেশি কমজোর হয়ে পড়ে। বিশেষ করে ভাঙ্গা হাত-পা যদি প্লাস্টার-করা অবস্থায় কয়েক সপ্তাহ থাকে, তাহলে এমনটা হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহায়ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নায়ুতন্ত্রের গবেষণায় দেখা গেছে, মস্তিষ্ক যদি প্লাস্টার-বাঁধা হাত দিয়ে কল্পনায় নানা কসরত করতে থাকে তাহলে পেশির দুর্বলতা অন্তত ৫০ ভাগ ঠেকান যায়।

এও দেখা গেছে যে যাঁরা তাঁদের প্লাস্টার-করা অচল হাত দিয়ে মনে মনে কঠীন সব কাজ করে থাকেন, প্লাস্টার খোলার পরে তাঁদের হাতের পেশি পূর্ণ শক্তি ফিরে পায় তাড়াতাড়ি।

সূত্রঃ এপিএস

গানের ভাষা

১ পাতা থেকে

পিগমিদের রেকর্ড-করা গান বাজানো হল, সেখানকার শ্রোতারা তা উপোভোগ করলেন। যদিও পিগমিদের ভাষা তাঁদের অজানা, সুর অপরিচিত। দু ক্ষেত্রেই, কী করে জানা গেল ভাল লাগার কথা? বিজ্ঞানীরা মুখের কথায় নির্ভর করেন নি। কোনও কিছু ভাল লাগলে সেই ভাল লাগার যে সব চিহ্ন শরীরে ফুটে ওঠে সেগুলি বিচার করেই সিদ্ধান্ত নেন বিজ্ঞানীরা। অর্থাৎ, সঙ্গীতের তালে তালে হৃৎস্পন্দনের হার, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠানামা, হাতের তালুতে হাল্কা ঘামের লক্ষণ – এ সব বিশ্লেষণ করেই তাঁরা বোঝেন এক দেশের সুর অন্য দেশের মানুষেরও ভাল লাগে।

সূত্রঃ নিউজওয়াইজ

শরীর ঠান্ডা রাখতেই কি জেব্রার ডোরা?

জেব্রার শরীরের সাদা-কালো ডোরা প্রাণীদের মধ্যে তাকে এক বিশেষ স্থান করে দিয়েছে। দেখলে মনে হয় কোনও শিল্পী যেন খুব যত্ন করে রঙ তুলি দিয়ে তাদের শরীরে ওই নিখুঁত ডোরাকাটা নক্সা সৃষ্টি করেছেন। জেব্রার গায়ে ওই অনন্য অলঙ্করণ কেন? এ নিয়ে প্রাণী বিজ্ঞানীদের মধ্যে কৌতুহলের শেষ নেই। উত্তর খুঁজতে গবেষণা চলছে লাগাতার। আর সেই কারণেই নানা বিজ্ঞানী নানা কারণের কথা বলছেন থেকে থেকে।

কিছুদিন আগে, এক গবেষণা থেকে ধারণা হয়েছিল যে তাদের শরীরের ওই সাদা-

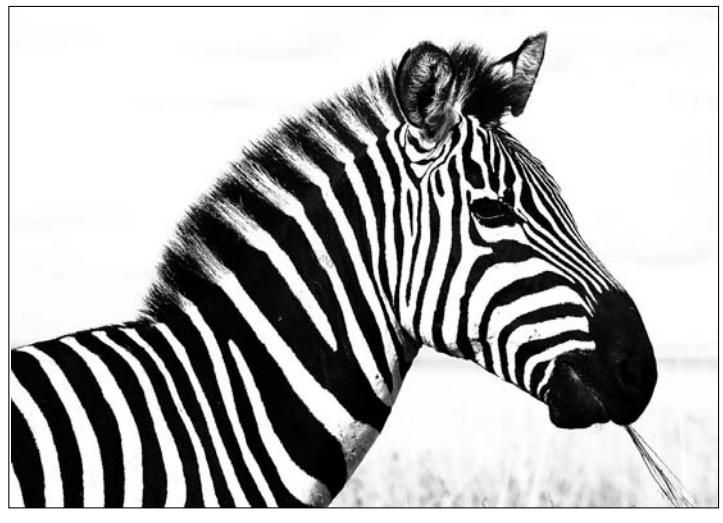

কালো ডোরা এক ধরণের মাছি যারা অসুখ ছড়ায় তাদের হাত থেকে জেব্রাদের রক্ষা করে। বলা হয়েছিল যে নিখুঁত সাদা আর কালো দাগগুলি ওই মাছিদের বিভ্রান্ত করে। তারা বুঝতে পারে না কোথায় বসলে তাদের অসুখ বিস্তারের কাজটি সহজে হাসিল হবে। এখন বলা যাচ্ছে যে সেটাই একমাত্র কারণ নয়। জেব্রাদের সাদা-কালো ডোরা তাদের শরীরকে ঠান্ডা রাখতেও সাহায্য করে। জেব্রারা দিনের অনেকটা সময় আফ্রিকার খর রোদে ঘাস খেয়ে কাটায়। তাই নিজেদের শরীর ঠান্ডা রাখতে হয় তাদের। আর এখানেই নাকি তাদের সাদা-কালো ডোরা বিশেষ কাজে আসে। বলা হচ্ছে তাদের শরীরে সাদা আর কালো দাগ থাকার ফলে বাতাসে তার প্রভাব পড়ে। সাদা অংশের ওপর বাতাস কালো অংশের তুলনায় ঠান্ডা থাকে, আর তার ফলে জেব্রার শরীরের চারপাশে হাওয়া চলাচল করে। এবং তাদের পক্ষে দিনের উত্তাপ সহনীয় থাকে। ইউনিভারসিটি অফ ক্যালিফরনিয়া (লস অ্যাঞ্জালিস)-এর গবেষকরা এমনটাই দাবি করেছেন।

সূত্রঃ লাইভ সায়েন্স

বিন্টুরঙ্গ

এক ধরনের মাংসাশী প্রাণী এরা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা দেশে এদের দেখতে পাওয়া যায়। চিন, ভারত, লাওস, ক্যাম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়ার জঙ্গলে এদের বাস। কিন্তু তারা ক্রমাগত তাদের বাসস্থান হারাচ্ছে। ফলে সংখ্যাও কমছে তাদের। এদের গায়ে লোম থাকে। রঙ হয় কাল, খয়েরি আর ধূসর। নিশাচর প্রাণী। একা একা থাকতে ভালবাসে। শিকারে বেরয় রাতে। পাখি, ইঁদুর, পোকা ধরে খায়। ফল খেতেও ভালবাসে। ১০-১৫ বছর বাঁচে। এদের সব চেয়ে বড় শত্রু মানুষ। এদের মাংসের জন্য মানুষ এদের নির্বিচারে শিকার করে।

খড়ের শাড়ি

অন্ধ্র প্রদেশের মুআভা কৃষ্ণমূর্তি খড় দিয়ে শাড়ি বানিয়েছেন। তাঁর বাড়ি সে রাজ্যের গুন্টুর জেলায়। মুআভি খড় দিয়ে শাড়ি বানান তাই নয়, ব্লাউজ, হাত-ব্যাগ সহ আরও নানা রকমের জিনিস তৈরি করেন। তাঁর বানানো খড়ের শাড়ি পাঁচ থেকে সাত বছর অব্দি টেঁকে। মুআভা খড় ছাড়াও নারকেল পাতা, তালপাতা, সোরগাম পাতার মত অনেক পাতার তন্তু দিয়ে বোনা আর ফ্যাব্রিকের কাজ করেছেন। মুআভা তাঁর কাজ সকলকে শেখাতে চান আর চান যে তাঁর কাজ দেশে বিদেশে সমাদর পাক। **পরিষেবা**

আলো জ্বলে আর নেভে, ভেসে চলে ঝিনুক

ওদের বলা হয় সমুদ্রের ‘ডিস্কো’। ওরা যখন জলের নীচে ভেসে বেড়ায় তখন ওদের শরীরের মধ্যে আলো জ্বলতে-নিভতে থাকে। তাই ওদের নাম দেওয়া হয়েছে ডিস্কো। আসলে ওরা ঝিনুক জাতীয় এক ধরনের প্রাণী।

তাদের শরীরে ওই আলো কী ভাবে সৃষ্টি হয় তা এত কাল জানা ছিল না। অনেকে মনে করতেন হয়ত তাদের শরীরে এমন কোনও পদার্থ আছে যা আলো সৃষ্টি করে। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে যে ব্যাপারটা আদৌ সে রকম নয়। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভারসিটি অফ ক্যালিফরনিয়া (বার্কলে)-এর বিজ্ঞানী লিন্ডসে ডোয়ার্টি ওই ডিস্কোদের নিয়ে গবেষণা করেছেন। একবার ইন্দোনেশিয়ায় সমুদ্রে ডুব সাঁতার দেওয়ার সময় ওই বিচিত্র প্রাণীটির দেখা পান। দেখেন সমুদ্রে একটা আলোর বিন্দু নিভছে আর জ্বলছে আর ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছে জলের মধ্যে। “সেই থেকেই ভাল লেগে গেল ওই ঝিনুক জাতীয় প্রাণীটিকে,” বলেছেন ডোয়ার্টি। তারপরই শুরু হয় তাদের নিয়ে গবেষণা। এবং গবেষণায় জানা যায় যে, আসলে আলো তাদের শরীরে মোটেই জ্বলে ওঠে না। বরং তাদের গায়ে এমন এক ধরনের বস্তু আছে যা সমুদ্রের তলায় প্রবেশ-করা সূর্যের আলো এমন তীব্র ভাবে প্রতিফলিত করে যে মনে হয় তার শরীরের ভেতরেই যেন আলো জ্বলছে। যখন তারা সাঁতরে চলে তখন তাদের শরীরের সেই অঙ্গটি বড় আর ছোট হতে থাকে, আর সেই অনুপাতে সূর্যের আলো বেশি আর কম প্রতিফলিত হয়। ফলে, মনে হয় আলোটা যেন জ্বলছে আর নিভছে।

কিন্তু কেন এই ব্যবস্থা? প্রকৃতিতে তো বিনা কারণে কোনও কিছু ঘটে না। ডোয়ার্টি বলেছেন, এর কারণ দু’টি – এক দিকে শত্রুদের ভয় দেখানো, অপর দিকে শিকারকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা।

সূত্রঃ নিউজওয়াইজ

অনেক রকম অরণ্যে হাজারও অজানা প্রাণীর বাস

জেনে রাখা ভাল

অরণ্য যে কত প্রাণ পোকা মাকড়ের আবাসস্থল তার ইয়ত্তা নেই। অরণ্যের গাছপালাদের সঙ্গে সেই সমস্ত প্রাণীর সম্পর্ক একেবারে ওতোপ্রত জড়িত। কত রকমের অরণ্য, সেখানে কত প্রাণীর বাস। যেমন -

● বোরাল ফরেস্ট পৃথিবীর স্থলভূমির বৃহত্তম আবাসস্থল। এই অরণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চল, কানাডা, দক্ষিণ আইসল্যান্ড হয়ে নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, সুইডেনের মধ্যে দিয়ে চলেছে একেবারে রাশিয়া কাজাকস্থান, মঙ্গোলিয়া পর্যন্ত। উত্তর জাপানেও এই অরণ্যের দেখা মেলে।

● তবে স্থলভূমিতে যেসব অরণ্য আছে তাদের মধ্যে রেইন ফরেস্ট বা বর্ষারণ্যেই সব থেকে বেশি প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী থাকে। যেমন পৃথিবীতে যত রকমের গাছপালা ও প্রাণী আছে তাদের পাঁচ ভাগের এক ভাগের বাসস্থান হল ইন্দোনেশিয়ার বর্ষারণ্য।

যদিও সেখানে পাম অয়েল উৎপাদনের জন্য বিপুল অরণ্য ধ্বংসের ফলে তারা খুব দ্রুত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে।

● আবার পশ্চিম কানাডায় গ্রেট বেয়ার রেইন ফরেস্ট হল অত্যন্ত বিরল প্রজাতির ভালুকের বাসস্থান। কালো ভালুকের জ্ঞাতি গোষ্ঠী হলেও তার রঙ সাদা।

● এখন পর্যন্ত রেইন ফরেস্টে যত উদ্ভিদ আছে তার মাত্র ১% এর ওপরই সমীক্ষা চালানো হয়েছে তাদের মধ্যে বনৌষধির গুণাগুণ আছে কিনা জানার জন্য। অথচ প্রতি সেকেন্ডে এই ফরেস্টেরই প্রায় ফুটবল মাঠ সম অরণ্যাঞ্চল কেটে ফেলা হচ্ছে। অর্থাৎ জানার আগেই প্রতিদিন আমরা বিপুল অরণ্য সম্পদ হারিয়ে ফেলছি। আর অরণ্যকে তো পৃথিবীর ফুসফুস বলা হয়। কারণ অরণ্যের গাছপালাই কার্বন ডাই অক্সাইডকে অক্সিজেন’এ রূপান্তরিত করে।

● গাছে বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যে ওরাঙওটাংরাই বৃহত্তম। তারা মাটির থেকে বেশিরভাগ সময়ই গাছে কাটায়। কিন্তু প্রতিদিনই তাদের এই ঘর বাড়ি ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে কাগজ তৈরি ও পাম অয়েল প্লান্টেশনের জন্য।

সূত্র:গ্রিনপিস.অরজ.ইউকে

পূর্বপুরুষের অভিজ্ঞতা থেকে যায় জিনে

পৃথিবীর ডায়েরির অফিসের কাছেই একটা বড় বাজার, সল্ট লেকের সি.কে. মারকেট। প্রায় শ'দুয়েক পায়রা ওই বাজারের সামনে এক বট গাছে দিনেরবেলা বসে থাকে। থেকে থেকে ওরা বাজারের সামনে, বটগাছের পাশে, গাড়ি রাখার চাতালে দল বেঁধে নামে **(ছবি)**। ওরা মানুষকে ভয় পায় না, গাড়িকেও না। প্রয়োজনে, সরে সরে গিয়ে বাজারমুখী বা বাজারফেরতা লোকজনকে পথ করে দেয়। গাড়ি এসে দাঁড়ালে দু'হাত উড়ে গিয়ে আবার বসে গাড়ির পাশে, কিম্বা মাথায়। ওরা মানুষকে ভয় করতে ভুলে গেছে। কারণ ওরা দেখেছে মানুষ ওদের কোনও ক্ষতি তো করেই না, উপরন্তু মাঝেমাঝেই কারা সব এসে – কেউ হেঁটে, কেউ গাড়ি থেকে নেমে – তাদের গম, চাল, নানা ধরণের দানা খেতে দিয়ে যায়। অর্থাৎ, মানুষ তাদের কাছাকাছি এলেও কয়েক পুরুষ ধরে সি.কে. মার্কেটের ওই পায়রাদের মধ্যে আর ভয়ের অনুভূতি জাগে না।

তাই বলে কি তারা ভয় ভুলে গেছে? তা নয়। দেখা গেছে সন্ধ্যের পর বট গাছ ছেড়ে তারা চলে যায় আরও নিরাপদ আশ্রয়ে – যেমন বাজারের বাড়িটির নানা ফাঁকফোকরে বা পাশেই এক বহুতল স্কুলের উঁচু কার্নিসে, হুলো কিম্বা নিশাচর শিকারি প্যাঁচাদের নাগালের বাইরে। কেবল মানুষ সম্পর্কেই তারা আর ভীত নয়!

এমনটা কী করে হল? বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন যে কোনও প্রাণীর জীবনে একই ধরনের অভিজ্ঞতা বার বার হতে থাকলে সেই অভিজ্ঞতা তাদের জিনের ডি.এন.এ-তে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটায়, যার ফলে প্রাণীটির আচরণও যায় বদলে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা জিনের মধ্যে সেই পরিবর্তনের রেশ এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে প্রবাহিত হতে থাকে বলেও দাবি করছেন বিজ্ঞানীরা। জিন বিজ্ঞানের এই নতুন ধারাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমরি ইউনিভারসিটির দুই গবেষক ব্রায়ান ডায়াস আর কেরি রেসলার।

জিনে যা আছে

তাঁরা গবেষণা করেছেন ইঁদুরদের নিয়ে। চেরি-ব্লসম ফুলের গন্ধকে ইঁদুররা ভয় পায় না। কিন্তু গবেষণার ইঁদুরদের কাছে ওই ফুলের গন্ধকেই ভয়ের কারণ করে তোলা হয়। ফলে একটা সময় আসে যখন চেরি-ব্লসমের গন্ধ পেলেই ওই ইঁদুরগুলি ভয় পেতে থাকে। আবার দেখা যায় তাদের বাচ্চারাও একই ভাবে ভয় পাচ্ছে সেই গন্ধকে, এমনকী তাদের বাচ্চারাও। যদিও তারা ওই গন্ধের সঙ্গে ভয়ের কোনও ব্যাপার জড়িয়ে আছে তা জানত না কখনও। অর্থাৎ, ঠাকুমা, দিদিমা, দাদামশাইদের চেরি-ব্লসমের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কোনও এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা বা তথ্য নাতিনাতনিরা জানতে পারে তাদের মধ্যে প্রবাহিত জিনের মারফৎ।

আমেরিকার গবেষণাগারে ইঁদুররা যে ভাবে বংশানুক্রমে একটি ফুলের গন্ধকে ভয় পেতে শুরু করে, ঠিক সে ভাবেই সি.কে. মার্কেটের পায়রারা মানুষকে ভয় পেতে ভুলে যায়। জিনের মধ্যে দিয়ে বংশপরম্পরায় সি.কে. মার্কেটের পায়রাকুলে এই বার্তাই রটে যায় যে, "মানুষ হইতে সাবধান হওয়ার কারণ নাই।"

পিডি

বির্বতনের মধ্যে দিয়েই জন্মেছে মাদকাসক্তি

পৃথিবীজুড়ে নেশার অতি প্রচলিত বস্তু হল অনেক ধরনের ফল আর কিছু কিছু শস্য থেকে তৈরি নানা রকম পানীয়। ওই সব পানীয়র মধ্যে যে জিনিসটি রক্তের সঙ্গে মিশে মস্তিষ্কে গিয়ে নেশা সৃষ্টি করে তা হল 'অ্যালকহল' বা মূলত 'ইথানল' নামক এক পদার্থ। নেশা-সৃষ্টিকারী, অ্যালকহল মিশ্রিত পানীয় মানুষ পান করছে অতি প্রাচীনকাল থেকেই। আজ থেকে ১০ হাজার বছর আগেও মানুষ যে নেশার পানীয় সেবন করত তার ইঙ্গিত মিলেছে। দেখা গেছে মিশরীয় সভ্যতায় মানুষ ওই ধরনের পানীয় বা মদ তৈরি করত খেজুর থেকে। প্রাচীনকালে চিন দেশে মদ তৈরির জন্য ব্যবহার করা হত চাল আর মধু। আধুনিক কালে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সব জনগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব পদ্ধতি আর নিজস্ব উপাদান দিয়ে নেশার নানা রকম পানীয় প্রস্তুত করে, এবং তা পান করা হয় সামাজিক বন্ধন গড়তে, অথবা নিছকই আমোদের জন্য বা নানা লোকাচার পালনের স্বার্থে।

অতীত কথা বলে

অথচ অ্যালকহল মানুষের শরীর গঠন বা বিকাশের জন্য মোটেই কোনও জরুরী বস্তু নয়। উপরন্তু বেশি মাত্রায় তার ব্যবহার যে শারীরিক এমনকী সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনে তার ভুরি ভুরি উদাহরণ ছড়িয়ে আছে দেশে দেশে। তা সত্ত্বেও অ্যালকহলের প্রতি মানুষের এই আসক্তি কবে থেকে আর কেন? মনে করা হয় ব্যাপারটা বিবর্তনের সঙ্গে খুব নিবিড় ভাবে যুক্ত। সেটা ছিল সেই সময় যখন মানুষের পূর্বপুরুষরা গাছের ডাল ছেড়ে একটু একটু করে মাটিতে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। গাছে যখন তারা থাকত, তখন তাদের আহারের বড় অংশ ছিল গাছে ফলে থাকা নানা ধরনের টাটকা ফল। পাড় আর খাও - এটাই ছিল রীতি। কিন্তু ধরাতলে বসবাসে যতই তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠল ততই তাদের গাছে ওঠার ও ডালে ডালে ঘুরে বেড়ানর ক্ষমতা কমতে থাকল। এবার তাদের গাছ থেকে পেড়ে খাওয়ার বদলে মাটিতে পড়ে থাকা ফলের ওপরেই নির্ভর করতে হল। আর সব সময় যে তরতাজা ফল মিলত তাও নয়। তেমন হলে একটু আধটু পচন-ধরা ফলও খেতে বাধ্য হত তারা। এবং ওই আধপচা ফলেই থাকত অ্যালকহল, কারণ পচন ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যবস্তুতে তা উৎপন্ন হয়। আর সেই ফল খেয়ে মেজাজটা বেশ ফুরফুরে হত আমাদের পূর্বপুরুষদের।

অ্যালকহলের প্রতি আকর্ষণ সেই থেকেই শুরু। বনে জঙ্গলে আজও অনেক জীবজন্তু আছে যারা মাঝে মাঝেই অ্যালকহলে পরিপূর্ণ ফল খেয়ে কিছুক্ষণের জন্য মাতাল হয়ে টলমল পায়ে আত্মভোলা হয়ে ঘুরে বেড়ায় অথবা লম্বা ঘুম দেয়।

অগ্নীশ বড়ুয়া

মানুষের খাদ্য হয়েই বিপন্ন বৃহৎ সালাম্যান্ডার

পৃথিবীর বৃহত্তম উভচরের মর্যাদা পেয়েছে সে। প্রায় ৬ ফিটের কাছাকাছি লম্বা পৃথিবীর বৃহত্তম স্যালাম্যান্ডার হিসেবেও পরিচিত এই চাইনিজ জায়েন্ট স্যালামান্ডার। কিন্তু হলে কী হবে খেয়ে খেয়েই তাকে বিপন্ন প্রাণীর লাল তালিকায় নাম লিখিয়ে দিয়েছে চিনারা। আসলে খাদ্য হিসেবে সে না কি অত্যন্ত 'উপাদেয়'। সনাতনী চিনা ওষুধ তৈরির কাজেও তার বহুল ব্যবহার, পাশাপাশি জল দূষণ ও তাদের বাসস্থান ধ্বংস, তাকে মূলত বিপন্ন করে তুলেছে। এতটাই বিপন্ন যে ১৯৫০ সাল থেকে তাদের প্রায় ৮০ শতাংশই শেষ হয়ে গেছে।

এই চিনে দৈত্যাকার স্যালামান্ডাররা বেশ কথাবার্তা বলতে পারে, ডাকাডাকি চ্যাঁচামেচি সবই চালায় নিজেদের মধ্যে। অবশ্যই নিজেদের ভাষায়। এবং কখনও কখনও তাদের সেই হাঁক ডাক শুনে ভ্রম হয় বুঝি কোনও মানুষের বাচ্চা কাঁদছো। এই স্যালামান্ডাররা 'জীবন্ত ফসিল' হিসেবে গন্য। কারণ প্রায় ১৭ কোটি বছর আগে সেই

চিনের বৃহৎ স্যালাম্যান্ডার

জুরাসিক যুগের বাসিন্দা ছিল এই দৈত্যাকার স্যালামন্ডাদেরই পূর্বপুরুষরা। চিনের পাথুরে পাহাড়ি নদী বা লেকে থাকে তারা। তাইওয়ানেও কিছু দেখা যায়। এক সময় মধ্য, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ চিন সর্বত্রই তাদের দেখা যেত। সাধারণত ৩০০-৫০০০ ফিট উচ্চতায় অরণ্যাঞ্চলের খরস্রোতা নদী ও জলাশয়গুলিতে তাদের বসতি।

বিপন্ন যারা

চওড়া চ্যাপ্টা বিশাল মাথা, এদের বৈজ্ঞানিক নাম অহফৎরধং ফধারফর-ধহঁং । ছোট ছোট চোখ, ঘন বাদামি রঙের এই স্যালামান্ডারদের খাদ্য তালিকায় ব্যাঙ, মাছ, কাঁকড়া, পোকা মাকড় সবই রয়েছে। দৃষ্টিশক্তি তত প্রখর নয়, তাই গন্ধ আর স্পর্শই তাদের শিকার ধরার প্রধান অস্ত্র। এক এক বারে তারা ৪০০ - ৫০০ ডিম পাড়ে। এবং যতক্ষণ না ডিম ফুটে বাচ্চা হচ্ছে ততক্ষণ পুরুষ স্যালামান্ডাররা সেই ডিমের চারপাশে পাহারা দিয়ে বেড়ায় ৫০-৬০ দিন পর্যন্ত।

চিনা সরীসৃপ ও উভচরদের তালিকায় এই স্যালামান্ডাররা অনেক দিনই চরম বিপন্ন ও সংরক্ষিত প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত হলেও প্রতি বছর অবৈধ ভাবে শ'য়ে শ'য়ে স্যালামান্ডার শিকার করা হচ্ছে। এবং এদের সংরক্ষণের জন্য ১৯৮০ সাল থেকে চিন সরকার চোদ্দটি প্রাকৃতিক সংরক্ষিত অঞ্চল গড়ে তুলেলও স্যালামান্ডারদের সংখ্যা ক্রমশই। কোনও কোনও জায়গায় একদম বিলুপ্ত। চিনা সনাতনী ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগলেও প্রধানত 'লাক্সারি ফুড আইটেম' হিসেবে চিনে খাদ্য তালিকায় উঠে আসাই তার পক্ষে বড় কাল হয়েছে।

শিকারিরা প্রতি কেজি প্রায় ৫০০০ টাকায় তাদের মাংস বেচে দেয় ব্যবসায়ীদের কাছে। যদিও বানিজ্যিক ভাবে এখন এই স্যালামান্ডার চাষ হচ্ছে, কিন্তু অনেকেই মনে করেন, প্রায়ই তাদের ধরা হয় প্রকৃতি থেকে। তবে সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে চিনে শিল্পায়ন ও বড় বড় জলাধার নির্মানের জন্য ২০০০ সালের মধ্যে চিনের এই জায়েন্ট স্যালামান্ডারের বসতির ৯০%ই ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রজাতিটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। এটি শেষ হলে বছরে প্রায় ৬০ হাজার স্যালামান্ডার জন্মাবে। তখন আর প্রকৃতির ওপর ডাকাতি করতে হবে না।

সূত্রঃ উইকিপডিয়া

আগাছার হাত থেকে বাঁচতে ছাগলই ভরসা

কথায় বলে - ছাগলে কি না খায়। এবং এই সব কিছু খেয়ে ফেলার প্রবণতাই আমেরিকায় তাদের প্রায় হিরো বানিয়ে ফেলেছে। বেশ কিছু দিন ধরে ওয়াশিংটনের বাইরে মাঠ ঘাট যে আগ্রাসী আগাছায় ঢেকে যাচ্ছিল, মুড়িয়ে কেটে, নানা রকম ওষুধ বা আগাছা নাশক দিয়েও প্রবল বেগে ধেয়ে আসা ওই আগাছাদের আগ্রাসন কোনও ভাবেই ঠেকানো যাচ্ছিল না। কিন্তু হঠাৎই একদিন ব্রায়ান কক্স লক্ষ করলেন তার ছাগল অ্যান্ডি সেই আগাছা এমন ভাবে সাবাড় করছে যে, সেখানে ওই গাছের বাড় বাড়ান্ত একদম থমকে গেছে। এবং এই ঘটনাই অ্যান্ডি ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের 'ইকো গোট'র মর্যাদা দিয়েছে ।

বিবিসি'র একটি প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যাচ্ছে যে, এই ইকো গোট তথা পরিবেশ বান্ধব ছাগলের দলটির বর্তমানে খুবই কদর হয়েছে। কারণ আমেরিকার পূর্ব উপকূলে জায়গা জমিতে হু হু করে বেড়ে চলা ওই 'বহিরাগত' আগ্রাসী গাছ ও আরও নানান আগাছা খেয়ে তাদের আগ্রাসন রীতিমত রোধ করে দিচ্ছে তারা। আসলে বিষাক্ত গাছই হোক বা অন্যান্য আগাছা - সবই এই ছাগলরা খেয়ে হজম করে ফেলে। আর এই ক্ষেত্রে ইকো গোটদের দলটি এমন দ্রুততায় ধেয়ে আসা আগাছাদের সাফ করছে যে তাদের চাহিদা খুব বেড়ে গেছে। তাই এই সব দেখে শুনে তাঁর আগাছা খাওয়া ছাগলদের নিয়ে রীতিমতো

সার্ভিস বা পরিষেবা চালু করেছেন ছাগল মালিক কক্স। এবং গত সাত বছর ধরে এই ছাগলরা হাজার হাজার টন নানা প্রজাতির আগাছা খেয়ে সাফ করে ফেলায় এই পরিষেবা বেশ সাফল্যও পেয়েছে। ইকো গোটরা তাই এখন রীতিমত হিরো।

আসলে খুব দ্রুত বেড়ে চলা আগাছা, যারা অন্যান্য গাছপালাকে ধ্বংস করে দেয়, তাদের মোকাবিলায় সনাতনী যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক ইত্যাদি ব্যবহার তো হয়েই থাকে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওই সব রাসায়নিক ব্যবহার করলে তা মাটিকে ক্রমেই দূষিত করে তোলে। এবং সেই রাসায়নিক আগাছার নতুন বীজ অঙ্কুরিত হওয়াকেও ঠেকাতে পারে না। আবার অন্য দিকে মেশিনের সাহায্যে ওই আগাছা উপড়ে ফেললে, তাতে দেখা যাচ্ছে মাটি আল্গা হয়ে যায় যা ভূমি ক্ষয়ের কারণ হয়ে ওঠে। তাই কক্স'র মতে এই সমস্যা সমাধানে ছাগলই হল সহজ জৈবিক একটি সমাধান। তবে কক্স'র মতে, এটা মোটেই কোনও নতুন আবিষ্কার নয়। বরং খুবই একটি প্রাচীন ব্যবস্থা। তাই ঠিক আবিষ্কার নয়, বরং বলা যেতে পারে আমরা এই ব্যবস্থাটিকে পুনরাবিষ্কার করেছি।

তবে আবিষ্কার বা পুনরাবিষ্কার যাইহোক, ছাগলের সাহায্যে বেশ ঘোরতর একটি সমস্যার সমাধান তো করা যাচ্ছে।

RNI Regn No. WBBEN/2000/1531 Date of Publication: February 1, 2015 Postal Regn No.KOL RMS/262/2013-15

অবাক পৃথিবী

● ডলফিন সমাজেও নাকি সকলের আলাদা আলাদা নাম আছে। এবং সেই নামে তারা পরস্পরকে ডাকে।

● শিম্পাঞ্জির ছানারাও পুতুল নিয়ে খেলতে ভালবাসে।

আটলান্টিকে যত জল আছে, আন্টার্কটিকায় তত পরিমান বরফ আছে।

● উইনস্টন চার্চিলের তোতাপাখিটিই পৃথিবীর প্রবীণতম যার বয়স ১০৪।

● সি-হর্সরা সঙ্গী নির্বাচন করে বা জোট বাঁধে সারা জীবনের জন্য। এবং যখন তারা কোথাও যায় পরস্পরকে তারা ধরে রাখে লেজের সাহায্যে।

● হামিঙবার্ডই একমাত্র পাখি যে পিছনের দিকে এবং পাশের দিকে উড়তে পারে।

বাঘ বেড়েছে ভারতে, সংখ্যা এখন ২,২২৬

ভারতে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে - এক লাফে প্রায় ৩০ শতাংশ। ভারত সরকার সম্প্রতি এ কথা জানিয়েছে বলা হয়েছে যে ২০১১ সলে ভারতে ১৭০৬ বাঘ ছিল। ২০১৪ সালে তাদের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,২২৬। পরিবেশ মন্ত্রী প্রকাশ জাভাদেকার বলেছেন ভারতে বাঘ বাঁচাতে যে কাজ চলেছে তার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। উনি বলেছেন যে সারা পৃথিবীতে বাঘের সংখ্যা যেখানে কমে যাচ্ছে ভারতের বনে জঙ্গলে তাদের বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে। পৃথিবীতে যত বাঘ আছে তার ৭০ শতাংশই আছে এ দেশে।

বলা হয়েছে যে এবার যে ভাবে বাঘ গণনা করা হয়েছে আগে কখনও তা হয় নি। ওই গণনা কাজে ক্যামেরার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ফলে মন্ত্রী বলেছেন এখন ভারতের ৮০ শতাংশ বাঘের ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে।

গত শতাব্দীর শুরুতে ১০০,০০০ এরও বেশি বাঘ ছিল পৃথিবীর অরণ্যে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড-এর হিসেব অনুযায়ী এখন আছে মাত্র ৩,২০০। বিখ্যাত লেখক রাডইয়ারর্ড কিপলিং-এর মতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ভারতেই ছিল ৫০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ বাঘ। ১৯৭১ সালে তা কমে দাঁড়ায় ১,৮০০।

পিডি

পৃথিবীর ডায়েরি

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩০ টাকা (ডাক মাশুল সহ)

স্কুল, কলেজ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, যে কোনও অন্য সংস্থা অথবা ব্যক্তিবিশেষ এই পত্রিকার গ্রাহক হতে পারেন। মানি-অর্ডার বা চেক দ্বারা টাকা পাঠান। চেক লিখবেন Prithibir Diary নামে।

যোগাযোগের ঠিকানা:
প্রকাশক
পৃথিবীর ডায়েরি
সি-এল ২৫৫, সেক্টর-২, সল্ট লেক, কোলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪/৯৪৩৩০৪৬৬৯৫

পাতিরাম

(কলেজস্ট্রিট–হ্যারিসন রোড ক্রসিং)
পৃথিবীর ডায়েরি পাওয়া যায়

ক্যুইজ?!?!

১। ২০১৪'র ২১ জুন প্রথম বিশ্ব জিরাফ দিবস হিসেবে পালিত হয়েছিল। ওই তারিখে কেন?
(ক) ২১ জুনকে অনেকে লেখেন ৬.২১। এই পর্যন্ত দেখা সব থেকে লম্বা জিরাফের উচ্চতা ২১.৬ মিটার (খ) ২১ জুন উত্তর গোলার্ধের দীর্ঘতম দিন আর জিরাফ হল দীর্ঘতম প্রাণী (গ) ১৭০৪ সালে ওই তারিখে একটি জীবিত জিরাফ লন্ডন পৌঁছয় এবং ইউরোপীয়রা সেই প্রথম জিরাফ দেখে (ঘ) প্রতিদিন একটি জিরাফ খাদ্যের সন্ধানে গড়ে ৬.২১ বর্গ কিলোমিটার ঘোরে

২। আরবি ভাষাতে 'হারাম' মানে নিষিদ্ধ বা পাপ। তাহলে 'বোকো হারাম' কিসের বিরুদ্ধে?
(ক) কোনও নির্বাচিত সরকারকে কর দেওয়া (খ) চেয়ার টেবিলে বসে লেখাপড়া করা (গ) বিদেশি ভাষা (অর্থাৎ মাতৃভাষা বা আরবি ছাড়া অন্য কোনও ভাষা) - তে লেখা বই পড়া (ঘ) পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার অনুসরণ

৩। প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এবং অন্যত্রও পুষ্টির অভাব মেটাতে ভিটামিন, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক এবং লোহাতে ভরপুর কি জিনিস খাদ্য হিসেবে জনপ্রিয় করার খুব চেষ্টা হচ্ছে?
(ক) এক রকম ঝিঁ ঝিঁ পোকা (খ) পাহাড়ি লবণ (গ) মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা (ঘ) বন্য টিকটিকি

৪। রঞ্জি ট্রফি বিজেতাকে যে স্মারক পুরস্কার বা ট্রফি দেওয়া হয় সেটি কে দান করেছিলেন?
(ক) পাতিয়ালার ক্রিকেট অনুরাগী মহারাজা ভূপিন্দর সিং (খ) নওয়ানগর রাজ্য যেখানে রঞ্জিৎ সিংজি শাসক ছিলেন জাম সাহিব বা শাসক ছিলেন (গ) তৎকালীন ব্রিটিশ ভারত সরকার (ঘ) এমসিসি

৫। ঠিকানার পিনকোড ৭৯ দিয়ে শুরু ভারতের কোথায়?
(ক) আন্দামান নিকোবর (খ) সিকিম (গ)ঝাড়খন্ড (ঘ) উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলি

৬। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় প্রতীকে কোন দুই প্রাণী দেখানো আছে?
(ক) কোয়ালা আর প্লাটিপাস (ঘ) ক্যাঙারু আর কুকাবুরা (গ) ক্যাঙারু আর এমু (ঘ) কোয়ালা আর এমু

৭। আমাদের সৌর জগতের কোন গ্রহে দিনে রাতে তাপমাত্রার ফারাক সব থেকে বেশি - রাতে ১৭৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট আর দিনে ৩৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট?
(ক)বৃহস্পতি (খ) শনি (গ) বৃধ (ঘ) নেপচুন

৮। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের হল অফ ফেম এ একমাত্র ভারতীয় কার নাম আছে?
(ক) সুনীল ছেত্রী (খ) গোষ্ঠপাল (গ) বাইচুঙ ভূটিয়া (ঘ) চুনী গোস্বামী।

৯। কোন দেশের জাতীয় পতাকাতে কালাশনিকভ একে ৪৭ রাইফেল আছে?
ভেনিজুয়েলা (খ) ইয়েমেন (গ) সার্বিয়া (ঘ) মোজাম্বিক

১০। মহাকাশে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকারী প্রথম প্রাণী হল লাইকা। সেটি কী ছিল?
(ক) ইঁদুর (খ) কুকুর (গ) বিড়াল (ঘ) বাঁদর

উত্তর: ১/ক; ২/ঘ নাইজেরিতে ঔপনিবেশিকরা যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে হাউসা ভাষাতে, তাকে বলে 'ইলিমিন বোকো'। তার থেকে বোকো'র মানে হয়ে গেছে পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষা; ৩/ক; ৪/ক; ৫/ঘ; ৬/গ; ৭/গ; ৮/গ; ৯/ঘ; ১০/খ ।

স্বত্বাধিকারি মালবী গুপ্তর পক্ষে অনীশ গুপ্ত দ্বারা ইন্সট্যান্ট প্রিন্ট. ৭০এ, এস.এন. ব্যানার্জি রোড. কোলকাতা-১৪ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক: মালবী গুপ্ত। যোগাযোগ: সি-এল ২৫৫, সল্টলেক-২, কলকাতা-৭০০০৯১। ফোন: ২৩৫৮-৫৬৯৪। ই-মেল: prithibir_diary@rediffmail.com